The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 97-120
ISSN 2306-3920, DOI :

বুধগুপ্তের মহাতি-রক্তমালা তাম্রশাসন বিশ্লেষণে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাস

মো. আদনান আরিফ সালিম*

[**সার-সংক্ষেপ :** প্রাক-পাল যুগের বাংলার ইতিহাসে তাম্রশাসন সংক্রান্ত দলিল অত্যন্ত বিরল। এই প্রেক্ষাপটে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে সদ্য আবিষ্কৃত মহাতি-রক্তমালা নামের গুপ্তযুগীয় তাম্রলিপি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করছে। এটি ৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে বুধগুপ্তের শাসনকালে জারি হয় এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভূমি-বিক্রয় দলিল, যা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পতিত জমি দান সংক্রান্ত। বর্তমান গবেষণায় উক্ত তাম্রলিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার, পাঠ যাচাই, বঙ্গানুবাদ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রাক-পাল যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষভাবে, এই দস্তাবেজটি ধর্মীয় দানপত্র হিসেবে ভূমি দান প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করছে। দলিলটি জমি দানের উদ্দেশ্য এবং তা কিভাবে সমাজে ধর্মীয় কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তার একটি স্পষ্ট চিত্র প্রদান করছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন নথির সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে পুন্দ্রবর্ধনের ইতিহাসের এক অনালোকিত অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় কাঠামো সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করছে। বুধগুপ্তের শাসনকাল প্রাক-পাল যুগের পুণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, এবং এই দলিলটি সেই যুগের জীবনধারা ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্থান পেয়েছে।]

মূল শব্দ : পুণ্ড্রবর্ধন, উত্তর বাংলা, তাম্রপট্ট, শিলালিপি, সংস্কৃত, জমি-বিক্রি, বুধগুপ্ত, প্রদ্যুম্নবন্ধু, গরুড়-সিল, ঘোষদ্বীপক।

ভূমিকা

বাংলার প্রাক-পাল যুগের ইতিহাসের উপযুক্ত সূত্রনির্ভর অনুসন্ধান দীর্ঘকাল ধরে এক গভীর সংকটের সম্মুখীন ছিল। সমগ্র অবিভক্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পালবংশের উত্থানের পূর্ববর্তী সময়ে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রলিপির সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য—গোটা সময়পর্বে যেখানে মাত্র একটি খণ্ডিত শিলালিপি পাওয়া গেছে, সেখানে তাম্রলিপির সংখ্যা বিশটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অল্পসংখ্যক দলিলের কারণে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস বহু দিক থেকেই অনাবিষ্কৃতই থেকে গিয়েছিল।

* **ড. মো. আদনান আরিফ সালিম :** সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে সাম্প্রতিক দশকে প্রাচীন তাম্রলিপি-নির্ভর গবেষণায় আশাব্যঞ্জক কিছু নতুন অনুসন্ধান সূচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি নতুন তাম্রপত্র ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ে কিছুটা আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু দলিল সরকারি সংরক্ষণাগারে যুক্ত হলেও, অনেকগুলো এখনো ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের হস্তে অবস্থান করছে—এবং তার একাংশ বিদেশি সংগ্রাহকদের কাছেও পৌঁছে গেছে, যেগুলোর অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে নিরূপণ করা বাস্তবতার নিরীখে বেশ কঠিন বলেই প্রতীয়মান।

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নতুন তাম্রলিপিটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, এবং এগুলো পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের (আধুনিক উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সমতুল্য) প্রাচীন ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাম্রশাসনটি গুপ্ত যুগের ১৫৯তম বর্ষের (৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ) দলিল যা বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ইস্যু করা হয়েছিল। এই সময়কালটি পুন্দ্রবর্ধনের ইতিহাসে একেবারেই নথি-শূন্য ছিল, ফলে এই দলিলটি সেই শূন্যস্থান পূরণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তাম্রলিপিটি মূলত 'ভূমি-বিক্রয় অনুদান' (land-sale grants) শ্রেণিভুক্ত, যা প্রাক-পাল বাংলার শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোর বিশেষ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। এগুলো রাজকীয় শাসন-ঘোষণা নয়; বরং সংস্কৃত গদ্যে রচিত একটি নির্দিষ্ট অনাবাদী জমি (খিলক্ষেত্র) কোনো ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রাপককে দানের লিখিত স্বীকৃতি, যেখানে দানকারী পুণ্যলাভের আশায় স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরের বিনিময়ে নির্ধারিত অর্থ প্রদান করে।

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য মহাতি-রক্তমালা তাম্রশাসন প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার ও অনুবাদসহ উপস্থাপিত হচ্ছে এমন নয়। এখানে পুনর্পাঠের পাশাপাশি লিপিটির উপযুক্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলোর প্রাথমিক পাঠোদ্ধার করেছিলেন ফ্রেঞ্চ স্কুল অব এশিয়ান স্টাডিজের আর্লো গ্রিফিথ। এই নথিগুলোর বিষয়বস্তু কীভাবে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-গবেষণায় নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারে তা এ গবেষণায় বিশেষ স্থান পেয়েছে। মূলত, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-সামাজিক পরিবেশ, ভূমির ওপর অধিকার, ও স্থানীয় প্রশাসনের রূপ বিশ্লেষণে লিপিটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পূর্ববর্তী গবেষণা :

বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের লিপিমালার সংখ্যা নিতান্ত কম। নাটরের ধনাইদহ, কালাইকুরি-সুলতানপুর, দামোদরপুর, জগদীশপুর, পাহাড়পুর, এবং নন্দপুর তাম্রশাসনগুলি এর সময়ের নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তবে দামোদরপুর থেকে প্রাপ্ত পাঁটি তাম্রশাসনের তারিখ, স্থান এবং প্রকাশের ভিত্তিতে বিভিন্ন গবেষক বেশি সংখ্যক কাজ করেছেন। এগুলো নিয়ে তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন কমবেশি সবাই। শুরুতেই আর্লো গ্রিফিতের মাইলফলকতূল্য গবেষণা "New Documents for the Early History of Pundravardhana: Copperplate Inscriptions from the Late Gupta and Early Post-Gupta Periods" নিয়ে বলতে হয়। এই গবেষণায়, আরলো গ্রিফিথস, যিনি ফ্রেঞ্চ স্কুল অফ এশিয়ান স্টাডিজের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, গুপ্ত ও প্রাথমিক পর-গুপ্ত যুগের তাম্রশাসনগুলির মাধ্যমে "পুণ্ডবর্ধন" অঞ্চলের প্রাথমিক ইতিহাসের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন (Griffiths, A. 2015)।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই তাম্রশাসনগুলির মাধ্যমে পুণ্ডবর্ধন অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নতুন তথ্য উদঘাটন করা। গ্রিফিথস গবেষণায় উল্লেখ

করেছেন যে, এই তাম্রশাসনগুলির মধ্যে পাওয়া গেছে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য যা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। বিশেষত, তাম্রশাসনগুলির মধ্যে পাওয়া লেজেন্ডগুলি প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং শাসকদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে।

গুপ্ত ও পরবর্তী-গুপ্ত যুগের এই তাম্রশাসনগুলির তথ্যে শুধুমাত্র প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এমন নয়, বরং এটি ওই সময়ে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কেও মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। এই গবেষণা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক সংযোজন, কারণ এটি ঐতিহাসিক উৎসের মাধ্যমে পুণ্ডবর্ধন অঞ্চলের সমাজ এবং শাসনব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে (Griffiths, A. 2018). ।

গ্রিফিথস গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এসব তাম্রশাসনের সাহায্যে ইতিহাসবিদরা প্রাচীন ভারতীয় অঞ্চলের নানান সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলী নতুনভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের গবেষণা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রচীন ভারতের ইতিহাস, শিলালিপি, এবং প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় আরও কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে যা বর্তমান গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রীতি কুমার অগ্রওয়াল "গুপ্ত সাম্রাজ্যের তাম্রশাসন" নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। তিনি যুগের শাসকরা কীভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং তাম্রশাসনের ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা বিশ্লেষণ করেছেন।

তার গবেষণা গুপ্ত যুগের শাসকদের শাসনব্যবস্থা এবং রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়, যা ইতিহাসবিদদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তাম্রশাসনগুলি, বিশেষ করে গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা সেই সময়ের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মৌলিক বিষয়গুলির প্রকাশ ঘটায় (Griffiths, A. 2018)।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হলো হান্স টি. বাক্কার ও ইউকো ইয়োকোচি এর "স্কন্দপুরাপ" নিয়ে। তারা ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের উত্তর ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনের উপর গবেষণা যা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীরতা তুলে ধরে (Bakker, Hans T. (2014)।

লায়নেল ডি. বার্নেট তার গবেষণায় গুপ্ত যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। এই তাম্রশাসনটি, শাসক জয়নাগের শাসনকালের একটি প্রশাসনিক ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এটি শাসক কর্তৃক ভূমির মালিকানা, রাজস্ব সংগ্রহ এবং সমাজের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। এভাবে, বার্নেট তার গবেষণায় প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এবং আমাদের শাসনব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন (Barnett, L. D. 1925–26: 60-64). ।

গুপ্তযুগের শিলালিপি ও তাম্রশাসন নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন রাধাগোবিন্দ বাসক। তিনি "দামোদরপুর" ও "ত্রিপুরা" তাম্রশাসন নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি গুপ্ত যুগের এই দুটি তাম্রশাসন বিশ্লেষণ করেছেন, যা গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক এবং সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয় (Basak, R. 1919–20a)। "দামোদরপুর" তাম্রশাসনগুলি ভূমির মালিকানা, জমির ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে, এবং ত্রিপুরা তথা "টিপ্পেরাহ" তাম্রশাসনে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং শাসক কর্তৃক করা নানা ধরনের জমি বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়গুলির বর্ণনা পাওয়া যায়

(Basak, R. 1919–20b)। এই গবেষণাগুলি আমাদের গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক কাঠামো, রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দেয় এবং সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করে (Basak, R, 1919, 1920, 1921, 1922)।

রাধাগোবিন্দ বসাক তার তাঁর বিভিন্ন গবেষণায় মূলত গুপ্ত যুগের তাম্রশাসনগুলি বিশ্লেষণ করে এই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। তিনি সেই সময়কার রাজস্ব ব্যবস্থা, জমির মালিকানা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং সমাজের সংগঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন (Basak, R. 1919–20b)। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী তার গবেষণায় "ঘুঘরাহাটি" তাম্রশাসনের বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাচারদেবের অধীনস্থ এই এলাকা গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক কাঠামো এবং তার সাম্রাজ্যিক বিস্তারের ধরণ বুঝতে সাহায্য করে। তার কাজটি প্রাচীন ইতিহাস এবং শাসকদের রাজনৈতিক শক্তির বিস্তার সম্পর্কেও মূল্যবান তথ্য প্রদান করে (Bhattasali, N. K. 1925–6).। সুরেষ চন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণায় "জগজ্জীবনপুর তাম্রলিপি সম্পূর্ণভাবে পুনঃসম্পাদিত করেছেন। এই গবেষণাটি গুপ্ত যুগের শাসন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সমাজের সংগঠন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে (Bhattacharya, S. C. 2005)। এটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল, যা আমাদের সেই সময়কার শাসনব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক এবং ভূগোল সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দিয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

তাম্রশাসন, শিলালিপি বা প্রাচীন লিপিলেখ গবেষণায় পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা ও ভাষাবৈজ্ঞানিক দক্ষতা অপরিহার্য। এই গবেষণার মূল ভিত্তি হলো প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার (decipherment), অনুলিপি (transcription), ভাষাগত বিশ্লেষণ (linguistic analysis), এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা (historical interpretation)। গবেষকের প্রথম কাজ হলো শিলালিপির দৃশ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন করে অক্ষরগুলোর যথাযথ পাঠ নির্ধারণ করা। এরপর সংরক্ষিত পাঠকে সংস্কৃত বা প্রাকৃত, অথবা সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হয়, যাতে পাঠের অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ ও শৈলিক ধারা অনুধাবন সম্ভব হয়।

আরলো গ্রিফিথস (Griffiths, A. 2015) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় সম্পাদনামূলক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে মূল পাঠের যথাসম্ভব নির্ভুল উপস্থাপন জরুরি। তিনি শিলালিপির পাঠে পাঠান্তর বা সংশোধনমূলক চিহ্ন পাঠে না দেখিয়ে এগুলোকে পৃথক অংশে পাঠ বিশ্লেষণের সঙ্গে সংযুক্ত করার পক্ষে মত দেন। তদ্ব্যতীত, শিলালিপিতে দেখা যায় বানানরীতি ও ধ্বনিগত বিচ্যুতি, যেগুলো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতেও প্রচলিত ছিল। এ ধরনের ব্যতিক্রমকে গবেষণায় বোঝার চেষ্টা করা হয় ভাষার বিবর্তন ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে (Salomon 1998)।

শিলালিপি গবেষণায় অনিবার্য একটি ধাপ হলো এর ভূ-প্রেক্ষিত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা। একটি তাম্রশাসন বা শিলালিপি কেবল ভাষাবিষয়ক দলিল নয়; বরং তা এক সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল। যেমন, ভূমি-বিক্রয় তাম্রপত্রগুলি স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন বহন করে। সার্বিকভাবে, শিলালিপি-গবেষণা হলো আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary) চর্চা, যা প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বকে একত্রে বিশ্লেষণ করে একটি প্রাচীন লিপির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া অতীতকে আলোকিত করে তোলে।

আর্লো গ্রিফিথ তাঁর সম্পাদিত লেখ্যসূত্রে পঙ্‌ক্তি নম্বরসমূহ বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত এবং মূল পাঠ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বোল্ড অক্ষরে নির্দেশ করেছেন। কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধে এটাকে পুরো বেদবাক্য হিসেবে অনুসরণ করা হয়নি। অন্যদিকে তিনি শিলালিপি তথা তাম্রলিপির গদ্যাংশ একত্রে একক অনুচ্ছেদে রূপান্তরিত করেছেন। অন্যদিকে ছন্দবদ্ধ স্তবকসমূহ যার বেশিরভাগ অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত তার পৃথকভাবে বিন্যাস করে রোমান সংখ্যায় স্তবক নম্বর যুক্ত করে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন (Griffiths, A. 2015)।

বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় শিলালিপি-পাঠের দীর্ঘকালীন প্রচলিত প্রথা থেকে সচেতনভাবে সরে এসে, চেষ্টা করা হয়েছে সম্পাদিত পাঠকে মূল প্রতিলিপির প্রকৃত পাঠের যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখতে। পাশাপাশি পাঠে এমন কোনো সম্পাদনা বা সংশোধনসূত্র যুক্ত না করতে যা মূল শিলালিপি-তাম্রলিপিতে নেই। সুতরাং, পাঠের মধ্যে কোনো সংশোধনের চিহ্ন রাখা হয়নি। পরে প্রতিটি লিপির নিচে পৃথকভাবে একটি অনুচ্ছেদে, লাইন ধরে ধরে পাঠ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্লো গ্রিফিথ ঠিক যেভাবে পাণ্ডুলিপি ও তাম্রলিপিতে প্রচলিত সংস্কৃত বানানের সূক্ষ্ম বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেছেন (Griffiths, A. 2015) বর্তমান প্রবন্ধে সেটা অনুসরণ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যে হরফগুলো গৃহীত, সেগুলো সাধারণত পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। এছাড়া, নিম্নলিখিত সম্পাদনামূলক সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে অনেকটাই গ্রিফিথের আদলে-

(...): এমন উপাদান, যেগুলোর পাঠ সন্দেহজনক

[...]: এমন উপাদান, যা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত বা অপঠিত, কিন্তু ভাষাগত বিবেচনায় পুনর্গঠন সম্ভব

+...+: খোদাইকার কর্তৃক পঙ্‌ক্তির উপরে/নিচে পরবর্তীতে সন্নিবেশিত পাঠ

_ : একটি সম্পূর্ণরূপে অপঠিত বা বিলুপ্ত অক্ষর

⊔ : খোদাইকার দ্বারা ফাঁকা রাখা একটি অক্ষরের স্থান

°V : এমন স্বরধ্বনি, যা একটি পূর্ণ অক্ষর গঠন করে, অর্থাৎ ‘স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ’

· : বিরামচিহ্ন (virama)

* : এমন ব্যঞ্জনধ্বনি, যা তার অন্তর্নিহিত স্বর বাদ দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র বিরামচিহ্ন দ্বারা নয়—বরং অক্ষরের আকার ছোট করা বা তার স্বাভাবিক রূপ থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে গ্রিফিথ অনুসৃত এই রীতিনীতি অনুসরণ করে পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা যথাসম্ভব মূল তাম্রলিপির যথার্থতা অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছে।

লিপির পাঠ ও পর্যালোচনা

তাম্রশাসনটির পরিমাপ (১১ × ২২.৬) সেন্টিমিটার তবে এই মাপ তার মোটা দাগ বাদে। লিপিটির উভয় দিকেই যথাক্রমে বারো এবং চৌদ্দটি লাইন লেখা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটি ভালভাবে সংরক্ষিত, তবে লিপিটির ডান প্রান্তে প্রায় ৪.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত। সেখান থেকে কিছু অক্ষর হারিয়ে গেছে। পাশাপাশি কিছু স্থানে ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার কারণে অক্ষরের পাঠযোগ্যতা দুর্বল হয়েছে। তাম্রপত্রটির বাঁ দিকের প্রান্তে একটি সীল সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সিলটির ব্যাস প্রায় ৫.৫–৭ সেন্টিমিটার (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মহাতি-রক্তমালা তাম্রশাসন, সাল ১৫৯ (গুপ্ত যুগ), সীলটির ডান দিকের ছবি

তবে, দুর্ভাগ্যবশত, সীলটির পৃষ্ঠটি ব্যাপকভাবে ক্ষয়ে গেছে, এবং এটি একটি দ্বৈত রেখা দ্বারা দুটি ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশ, যা সীলটির মোট পৃষ্ঠের প্রায় তিন চতুর্থাংশ দখল করেছে, সেখানে একটি গজলক্ষ্মী চিহ্নের অবশিষ্টাংশ দেখা যাচ্ছে। নিচের এক চতুর্থাংশে দুটি লাইনে একটি প্রতীক তথা লিজেন্ডের ছাপ রয়েছে। এটি গুপ্ত যুগের উত্তর বাংলায় উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় তাম্রশাসন, যেখানে সীল এবং সীল-লিজেন্ড সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে (Khan 2010: 96)।

সীলটি গুরুতর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগে, এটি অন্যান্য সীলগুলোর মতো ছিল ()। সম্ভবত দ্বিতীয় তাম্রপত্রে ব্যবহৃত সীলের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে, যা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। সীলটির ডান পাশে একটি সেকেন্ডারি সীলও রয়েছে, যা প্রাথমিক সীলের সাথে প্রায় অনুরূপ ধরনের একটি সাধারণ বিন্যাসে স্ট্যাম্প করা হয়েছে। যদিও এর চিহ্নটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এটি গুপ্ত যুগের প্রথম এবং একমাত্র সেকেন্ডারি সীল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেকেন্ডারি সীল সম্পর্কে আরও আলোচনা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে করা হয়েছে।

মহাতি-রক্তমালা তাম্রশাসনের পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য

তাম্রশাসনে ব্যবহৃত লিপিটি একটি পরিণত পূর্ব ব্রাহ্মী লিপির ধরনকে নির্দেশ করে। এই লিপি একই সময়কালের অন্যান্য তাম্রশাসনগুলির লিপির সাথে একেবারে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই লিপির কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে—প এর একটি প্রাচীন আকার, এবং খ, গ, ঞ, পো, ধ, বো, ব্র ইত্যাদি অক্ষরের শেষে একটি ডাউনওয়ার্ড স্ট্রোক, যা লিপির ঐতিহাসিক আকার এবং তার সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

প্রসঙ্গ আরও উল্লেখ করার মতো এই লিপির আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিশেষত, এখানে কিছু হরফের মধ্যে কোনো দৃশ্যমান পার্থক্য নেই। সেগুলোকে বাক্যবিন্যাস ও অর্থ অনুযায়ী আনুমানিক ধারণা করে তার উপর পাঠোদ্ধার করতে হয়। এর ফলে তা গবেষকের উপর নির্ভর করে যে কোনটি ব্যবহৃত হবে কিংবা হবে না। এই লিপির মধ্যবর্তী ই/এ এবং ই/ঐ অক্ষরের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া বেশ কঠিন। এগুলো গবেষকদের জন্য কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে এর চূড়ান্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যেও রয়েছে নানাবিধ বিভ্রান্তি। যেমন ম* এবং ত*) ব্যবহারের নির্দিষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

খোদাই করার ক্ষেত্রে লিপিটির ব্যকরণগত কিছু বিচ্যুতি রয়েছে, তবে সেগুলি এতটা সাধারণ যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। নানাস্থানে পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে ব এবং ভ-এর মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। অন্যদিকে র-এর আগে বা পরে ব্যঞ্জনবর্ণগুলির দ্বিগুণকরণ কিছু জটিলতার জন্ম দিয়েছে।

দ্বিতীয় প্লেটে গেলে কিছু ক্ষেত্রে প-র জন্য এন ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে। প্রায়ই মনে হতে পারে যে লেখক অক্ষরের কিছু ছোট উপাদান যেমন অনুস্বার, বিশর্গ, অ- এবং ই-মাত্রার নানা স্থানে দৃশ্যমান ভুল পাঠ তৈরিতে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তবে এই তাম্রশাসনের সংস্কৃত ভাষা,বর্ণ ও শব্দশৈলীর ব্যবহারে তেমন গুরুতর কোনো ভুল পাওয়া যায় না। তবে অনেক গবেষক এর ব্যঞ্জন চিহ্নের কিছু ভুল থাকার কথা দাবি করেছেন। বিশেষত, ১৫তম লাইনের সেই নন্দভূতির); এবং একবচন ও বহুবচনের ক্রিয়া-রূপের মধ্যে বিভ্রান্তি স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। লাইনের হিসেবে ২১-২২ খেয়াল করলে সেখানে দস্যথা.... কিংবা পালায়ীষ্যসি নিয়ে গ্রিফিথসহ আরও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন (গ্রিফিথ 2018)।

বর্ণিত তাম্রশাসনটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক কাঠামো, রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সামাজিক সম্পর্কের নানা দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। সীল, লিপি এবং অন্যান্য অক্ষরের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক সূত্রগুলি আমরা উদ্ধার করতে পারি, তা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি অমূল্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য এক শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে।

মহাতি-রক্তমালা তাম্রশাসনের অনুরূপ সিল

লিপির পাঠ ও পর্যালোচনা

মহাতি রক্তমালা লিপির সিলের প্রধান পৃষ্ঠে দুটি লাইনে খোদাই করা একটি প্রাচীন এবং ব্যাপক ক্ষয়প্রাপ্ত লেজেন্ড রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে অন্য একটি লিপির সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে এটি পড়া সম্ভব হয়েছে। কাছাকাছি স্থান থেকে পাওয়া সিলটির দুটি ছবি পাওয়া যায। এটি মূল সিলের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকায় তার আলোকে এর তুলনা করা গিয়েছে। তবে সিলটির পরিচয় নিশ্চিত করতে আমাদের যেতে হবে মূল লিপির ১৪তম লাইনে উল্লেখিত একটি কঠিন অংশে। সেখানে পাওয়া শব্দটির মাধ্যমে এই সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে। প্রাপ্ত দুইটি সিলের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ লিজেন্ডের পাঠ হতে পারে **'মধ্যমক্ষেপদিকাবিদ্ধায়কাধিকারপস্যা'** এর অর্থ হতে পারে "মধ্যমক্ষেপদিকার" নিয়োগকৃতদের পরিষদ।

সেখানে এটি এমন এক পরিষদের উল্লিখিত শব্দ যা "মধ্যমক্ষেপদিকা" অঞ্চলের নিয়োগকৃত সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এর মানে হলো, এই সিলটি সেই পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হত, যা একটি প্রশাসনিক বা সামাজিক কাঠামোর অংশ হতে পারে।অন্যদিকে, দ্বিতীয় সিলটির লিজেন্ড সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে কিছু ছবি থেকে "প" বা "পতি" শব্দের অংশ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সম্ভবত কিছু অক্ষর "থা" এর অংশও দেখা যাচ্ছে।

প্রাপ্ত ছবিতে কিছুটা স্পষ্ট বিষয়টির খুঁটিনাটি দেখে সম্ভাব্য পুনঃস্থাপন হতে পারে 'যুথপতি'র অথবা যুপতি। তবে এটি কী ইঙ্গিত করে যে, সিলটি হয়তো "যুথপতি" নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত? কিংবা এটা তার অধীনে ব্যবহৃত ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট। অনুমান করা যেতেই

পারে এই "যুথপতি" শব্দটি একটি নেতা বা শাসকের পদের নাম হতে পারে, যা প্রাচীন সমাজের বিশেষ ধরনের শাসক বা প্রশাসনিক প্রধানকে নির্দেশ করে। ঠিক যেমন ব্রাহ্মী ভাষায় প্রাপ্ত লিপিতে আমরা 'মহামাত্র হিসেবে দুমদিনের নাম পাই। তবে এই সিলটি প্রাচীন সময়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং এটি সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারে।

মহাতি রক্তমালা লিপি (সম্মুখ ভাগ)

মহাতি রক্তমালা লিপির পাঠ
(সম্মুখ ভাগ)

(১) স্বস্তি মহাতিরক্তামালগ্রহরাত পরম-ভট্টারকপদানুদ্যাৎ কুমার-মত্যাযুথপতির অধিকারপান চ

(২) ক্ষুদিরক্তামালিকায়ল ব্রাক্ষপত্তারণ শক্ব্রদ্রপ্রধানাদিকুটুম্বিনো বোধয়ন্তি কুড্ডলাখটাধিবাসভ্যন্তর

(৩) মহাতিরক্তামালগ্রহরচতুর্বিদ্যাভ্যন্ত-রকোৎসসগোত্রবজাতসানেদ্যব্রাক্ষপানন্দভূতির বিজ্ঞাপয়তি য

(৪) ত পূজ্যের মামাতিতাসপ্ত-পঞ্চাসদুত্তরশতসংবৎসরে গোবর্ধনাক-গ্রামে যথানুর্বৃত্তবিক্রয়ক্রমেপ পুপদ্র-

(৫) ভার্দ্দানেযমহামাত্রসুবর্চ্চসদত্তোদ দিনরান উপাসলগ্রহ্য সমুদায়বাহ্যপ্রতীকারখিলক্ষেত্রকুল্যাব

(৬) পদ্বয়ম ক্ষায়ানিবিধর্ম্মেপ সস্বতকালোপভোগ্য দত্তক তদধুনৈকান্নাক্ষত্যতরশতসংবৎসরে পর

(৭) মাদেভৈর দুধোতিকা-বস্তব্যব্রাক্ষপানল স্বপূপ্যভিভৃদ্ধয়ে গোবর্ধনাকগ্রামো গরুত্ত পাসাসানেনাতিসৃষ্টাল

(৮) তান মায়া (প্)জ্যোপরিকাব্রাহ্মদত্তহ ⊔⊔ধিকারপে বিজ্ঞাপিতঃ মম গোবর্ধনাকগ্রাম পুপদ্র-ভার্দ্দানেযমহামাত্রসুবর্চ্চসদত্তেন

(৯) পঞ্চমাহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনয়া মাতাপিতরো অঙ্গ্রাহেপা সমুদায়বাহ্যপ্রতীকারখিলক্ষেত্রকুল্যবাপদ্বয়ম

(১০) ক্ষায়ানিবিধর্ম্মেপ দত্তক স চ গোবর্ধনাকগ্রাম পরমাদেভৈঃ স্বপূপ্যভিভৃদ্ধয়ে দুধোতিকা-বাস্তব্যব্রাহ্মপানল গরুত্তপাসাসানে-নাতিসৃষ্ট:

(১১) তান মা[মা] _ _ _ _ _ [তাম্র]-পট্ট

(১২) ক্ষেত্র _ _ (দত্তক) না বিনস্যেত তথা (প্র)সাধ কৃয়াতম ইতি যথ °এভলবিজ্ঞানপটোপল(ব) _ _ _ _ _ _ _

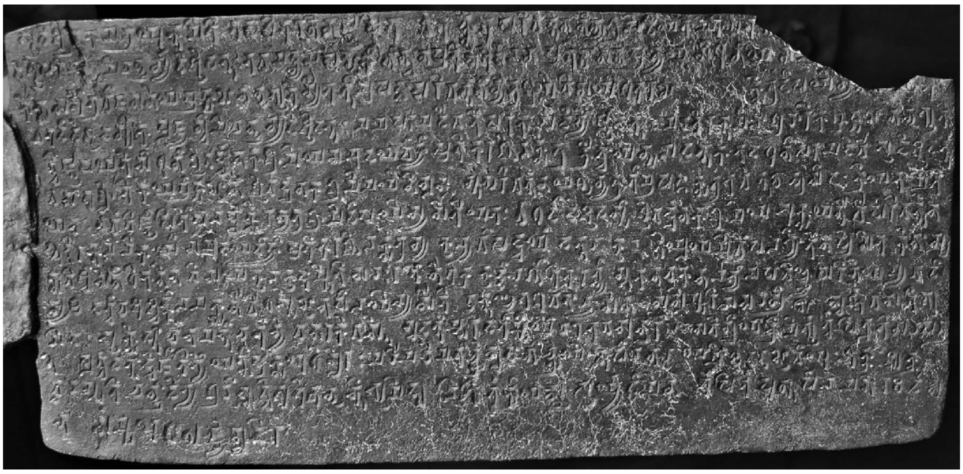

মহাতি রক্তমালা লিপি (পেছনের অংশ)

মহাতি রক্তমালা লিপির পাঠ

(পশ্চাৎ ভাগ)

(১৩) °আদেশো দাকম আত্র যুক্তম ইতি তদধিকার-নেনা জ্ঞাপিত °এতৎক্ষেত্রপরিবর্ত্তে নান্য-গ্রামো দীয়তাম (ই)তি যথা _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(১৪) দেশোপরিকস্বামিচন্দ্রস্যাদেশো দত্তঃ তব মদ্ধ্যমক্ত্রপদিকানান ধন প্রতি প্রতিপালন প্রতিভাসন প্রতিয়ায় সাধুনা যশ _ _ _ _ _ _ _ _

(১৫) কৌৎসসগোত্রবজাতসানেদ্যব্রাহ্মপানন্দভূতিঃ এয়ত্তম্রপট্টপরিবর্ত্তনন্যত্র গ্রামে বিশ্বধিকারপা⊔⊔⊔⊔ ক্ষেত্রাল দাপয়িক্ত্য- [সিতি] (য)তা(হ)

(১৬) °এতদাদেশাদ আস্মাকা পূজ্য-স্বামিচন্দ্রস্যাদেশো দত্তঃ মম পরম-দৈবাতপরিকাপদেভ্যো জ্ঞ দত্ত(া) মহতি-রক্তামালগ্রহরিকাব্রাহ্মপানন্দভূতি

(১৭) বিজ্ঞাপয়তি সাধুনা গোবর্ধনাকগ্রামে যস-সমুদায়বাহ্যপ্রতীকারখিলক্ষেত্র কর্ত্বা যন মম দত্তকাল তদধুনা পরমাদেভাই °আদেশ-দত্তাল

(১৮) এক্সাল দুধোতিকেব্রাহ্মপান গোবর্ধনাকগ্রামে মায়া নিঃসৃতঃ তৎপরিবর্ত্তনে যেমনন্যত্র তাম্রপট্টক্ষেত্রাল ভবেত তাথা প্রসাদঃ কৃয়াতম ইতি

(১৯) যথা এভলবিজ্ঞানপিটোপালৰূত অন্যত্র গ্রামে দাপয়িক্স্যসিতি যথা °এধরাদেশাদ আসমকাল গোবর্ধনাকগ্রামে-অক্ষয়ানিভিপরিবর্ত্তেনা

(২০) ক্ষুদিরক্তামালিকায় সমুদায়বাহ্যপ্রতীকারখিলক্ষেত্রসস্য কুল্যবাপদ্বযাল দত্তহা কু ২ তে ইউয়াম এভোপালভ্যোতোনা প্রেক্ষিতাকেনাস্মা

(২১) তসবিশ্বাসেনাধিকেনা বিশ্বয়-কুলকুটুম্বিবিহি সহ °ইতো নৈতিককুড্ডলাখটিকারতন্যক্তকানবাকানলভ্যাম আপবিণ্ড্য (পা)-রিনিয়াম্য চ দা

(২২) যথা দত্ত্বা চ সম্বতকালম অক্ষনিবিধর্ম্মেপনুপরালয়িক্স্যসিতি °উক্তং চ ভাগবতা ব্যাসেন শক্তিম বারিক্ষাহাস্রপি স্বর্গে বাসতি ভূ

(২৩) মিদাহ °অক্ষেপ্ত চনুমন্ত চ তন্য এভ নারকে বাসেত* স্বদত্তম পরদত্তম বা যো হরেতা বাসুন্ধারাম*সা বিশ্বথয়া ক্রিমির ভূত্বা পিতৃভি সহ পাচ্য

(২৪) তেহ পুর্ব্বদত্ত দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ রক্ষ্য যুধিস্থিরাহ মাহী মহিমতা চ্ছ্রেষ্ঠ দান চ্ছ্রেয়ো নুপালনম* যমো থা বরূপা বায়ুহ সাক্রাহ শুক্র

(২৫) ব্রহস্পতি চন্দ্রাদিত্যগ্রহাস সর্ব্বে °আভিনন্দন্তি ভূমিদাম* লিখিতাল কায়স্থ°আর্য্যদাসেন তাপিটাল পুথপালামানোরথাদাসে

(২৬) না সম্ভ ১০০ ৫০ ৯ জ্যেষ্ঠা দি ৮

মহাতি-রক্তমালা লিপির পাঠ পর্যালোচনা :

১. **মহাতিরক্ত-:** বিশেষত, মহাতিরক্তামালগ্রহরাত পরম-ভট্টারকপদানুঢ্যাৎ থেকে প্রাথমিকভাবে পাঠ সংশোধন করা উচিত। এখানে মহাতিরক্ত- এর পরের অংশ নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে ।

৩. -**চতুর্বিদ্যাভ্যন্ত-:** একে তুলনা করা যেতে পারে **পৌপদ্র-ভার্দ্ধনকাচতুর্ব্বিদ্যাভজাতসানেদ্যচরাপাব্যন্তর** এই বাক্যাংশের সাথে, যা কালাইকুড়ি-সুলতানপুর শিলালেখের ১৪ নম্বর লাইনে পাওয়া যায়।

৩. **-কোৎসা-:** এখানে **রকোৎসসগোত্রবজাতসানেদ্যব্রাহ্মপানন্দভূতির** -কৌৎস- পড়া উচিত। ঠিক অভিন্ন বিষয় আমরা ১৫ নম্বর লাইনে উল্লেখিত হতে দেখি **কৌৎসসগোত্রবজাতসানেদ্যব্রাহ্মপানন্দভূতিঃ** ।

৪. -**শতসংবৎসরে:** এখানে সংশোধন করা উচিত -**শতসংশব্দৎসরে।**

৪. **যথানুর্বৃত্তবিক্রয়-:** সংশোধন করা উচিত **যথানুর্বৃত্তবিক্রয়**-।

৪-৫. **পুপদ্রভার্দ্ধনেয়া-:** এটি ৩ নম্বর লাইনে জগদীশপুর শিলালেখ এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যদিও সেখানে তার সম্পাদক সিরকার পুপদ্রভার্দ্ধনেয়া পড়েন, যেখানে যা কে এ দিয়ে সংশোধন করেন (এবং তিনি মন্তব্য করেন যে **পুপদ্রভার্দ্ধনেয়া ‘পুপদ্রভার্দ্ধন-ভবিষ্য** বিষয়ে ভালভাবে বুঝে ওঠা যায় না’।

৫. **সুবর্চ্চসদত্তোদ দীনরান:** গুপ্ত যুগের বিভিন্ন কবি লিখে গিয়েছেন এই ধরণের বহু শব্দ। বিশেষত, বরাহমিহিরের লেখায় এই শব্দ পাওয়া গিয়েছে। এখানে স্পষ্ট সংশোধন **সুবর্চ্চসদত্তাদ**। কারণ ৯ নম্বর লাইনে গিয়ে এটি বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা দিয়েছে।

৬. **-ভোগ্য দত্তক: সম্বতকালোপভোগ্য দত্তক তদধুনৈকান্নাক্ষত্যুতরশতসংবৎসরে** থেকে এই অংশ সংশোধন করা উচিত **-ভোগ্যাল দত্তকাল**। পাশপাশি এখানেই **অধুনৈকন্নাক্ষত্তিউত্তরশতসংবৎসরে** থেকেও সংশোধন করা উচিত -**সংবৎসরে।** সংখ্যা একন্নাক্ষতি, যদিও খুবই কম ব্যবহৃত, পাণিনী (অষ্টাধ্যায়ী ৬.৩.৭৬) দ্বারা যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং ২৬ নম্বর লাইনের অঙ্কগুলি দ্বারা তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭. **-গ্রামো:** এখানে -গ্রামে সংশোধন করা উচিত, যাতে লেখক দুটি বিষয় - ভূমি এবং গ্রাম - নিয়ে বিভ্রান্ত না হন।

৮. -**দত্তঃ ⊔⊔ধি-:** এখানে দুটি শব্দের মধ্যে একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে। এটি **১৫** নম্বর লাইনের মতো মনে হয় যে, লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা জায়গা রেখেছিলেন, যাতে পরবর্তীতে পূর্ণ করা যায়। এখানে -দত্তো ভুক্তাধি- অথবা -দত্তস তাধি- (**১৩** নম্বর লাইনের সাথে তুলনা করুন) ছিল কি না, তা নিশ্চিত নয়।

৮. -**গ্রামঃ:** সংশোধন করা উচিত -**গ্রামে।**

৯. **সমুদয়-:** সংশোধন করা উচিত সমুদায়-।

১০. **দত্তক:** সংশোধন করা উচিত **দত্তকাল।**

১০. **গোবর্ধনাকগ্রাম:** সংশোধন করা উচিত **গোবর্ধনাকগ্রামহ**।

১১-১২. **[তাম্র]পট্টক্ষেত্র:** সংশোধন করা উচিত **তাম্রপট্টক্ষেত্**র। **১৮** নম্বরে এটি পাওয়া যায়।

১২. **°এভলবিজ্ঞানপটোপলাব্দ: ১৯** নম্বর লাইনের সাথে তুলনা করলে এখানে **°এভলবিজ্ঞানপটোপলব্ধাত** এই রূপটি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে এবং তারপর -বিজ্ঞানপিটোপ- এ সংশোধন করা উচিত।

১৩. **আদেশো দাকম আত্র যুক্তম:** এর অনুবাদ করা যেতে পারে **আদেশো দত্তঃ কিম আত্র যুক্তম** এই অনুমানকে ভিত্তি করে। অন্যান্য সম্ভাব্য সমাধানগুলোও চিন্তা করা যেতে পারে, যা পাঠ্যগত সমস্যার জটিলতা সৃষ্টি করেছে, কারণ আদেশো এর আগের শব্দগুলি হারিয়ে গেছে। আর্লো গ্রিফিথ **আদেশো দাকম** কে একক শব্দ হিসেবে পড়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করেছিলেন। তবে তিনি নিয়মিতভাবে আদেশো শব্দের পরে দত্ত শব্দটি থাকায় তিনি পরে আর তা করেন নাই। **তদধিকারণেন:** এখানে "প" (কারাপেন) পরিবর্তে "ন" (কারণেন) ব্যবহার করা উচিত, যেমন **২১** নম্বর লাইনে একই ধরণের শব্দ পাওয়া যায় বলে গ্রিফিথ দাবি করেছেন।

তবে তিন আরও কয়েকটি যুক্তি এখানে উত্থাপন করতে পারতেন যা মধ্যে গুপ্ত যুগের সাহিত্যকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। **-পরিবর্ত্ত(এ)না নন্য-:** এটি সংশোধন করা উচিত **-পরিবর্ত্তেনন্যা-**। দুর্ভাগ্যবশত, এখানে অনেকটাই পাঠ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, কী অর্থপ্রকাশ করা হয়েছিল তা নিশ্চিত করা কঠিন। **যথা:** এর পরে একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে। **১৯** নম্বর লাইনে **°এভলবিজ্ঞানপটোপলব্ধাত** এর সঙ্গে তুলনা করলে, এবং **১২** নম্বরে সম্ভবত একই রূপটির উপস্থিতি অনুমান করা যায়, এখানে **যথাহ °এভলবিজ্ঞানপটোপলব্ধাত** পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

১৪. **ধন প্রতি প্রতিপালনা প্রতিভাসনা প্রতীয়ায়া:** এখানে সম্ভবত, প্রত্যেকটি শব্দের শেষে **অনুস্বর** চিহ্ন পুনরুদ্ধার করা উচিত, তবে "প্রতি" এর ক্ষেত্রে নয়।

১৫. - **ভূতিঃস্যৈতত:** "ভূতিষ্য" অথবা "ভূতিস্য" (যেহেতু এই দুটি রূপ গ্রাফিকালি অদ্বিতীয়) একটি অপ্রমিত জেনেটিভ একবচন রূপ, যা আসলে **ভূতের** হওয়া উচিত, শুদ্ধ সংস্কৃতে। **-বর্ত্তেনন্যত্র:** সংশোধন করা উচিত **-বর্ত্তেনন্যত্র**। ১৩ এবং ১৮ নম্বরে এর তুলনা করা যেতে পারে। **বিশয়াধিকারপা⊔⊔⊔⊔ ক্ষেত্রল:** ৮ নম্বরে, মনে হচ্ছে, কিছু স্থান ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা হয়েছে। ১৮ নম্বরে যে বিশেষ **কারক** রূপ হবে যা **দা** ক্রিয়ার পেছনে প্রয়োগিত প্রভাবককে প্রকাশ করবে, যেমন সম্ভবত **বিশয়াধিকারপাকুটুম্বিভিঃ** । উদাহরণ হিসেবে দামোদরপুর শিলালেখের #৩, ১০ নম্বর লাইনের কথা বলা যায়।

১৬. **আস্মাকা:** সংশোধন করা উচিত **আসমকাল**। ১৯ নম্বর লাইনের বর্ণনা থেকে এটি দেখলে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যেতে পারে। সেখানে উল্লেখ হতে দেখা যায় °**এধরাদেশাদ আসমকাল গোবর্ধনাকগ্রামে-অক্ষয়ানিভিপরিবর্ত্তেনা**। **চন্দ্রস্যাদেশো:** সংশোধন করা উচিত **-চন্দ্রস্যাদেশো**। **-পদেব্যো জ্ঞ:** সংশোধন করা উচিত **-পদেব্যো °অজ্ঞ**।

১৭. **-ক্ষেত্র:** সংশোধন করা উচিত **-ক্ষেত্রাল**। **-দেবৈঃ °আদেশাদত্ত(অ):** সংশোধন করা উচিত **-দেবৈঃ আদেশাদত্তাল**। এই গঠনটি কিছুটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

১৮. **-ব্রাহ্মপান:** সংশোধন করা উচিত **-ব্রাহ্মপানাল**। **তৎপরিবর্ত্তেনা:** প্রথম দুটি অক্ষর "ই" মাত্রা রাখে, তবে সম্ভবত এগুলি শুধুমাত্র দুর্ঘটনাজনিত অক্ষর। **তাথা:** সংশোধন করা উচিত **তাথা**।

১৯. **-লাব্ধাত সৈর:** সংশোধন করা উচিত **-লাব্ধাত স্বৈর**। অথবা পড়া যেতে পারে **-লাব্ধাত কৈর**? অথবা **-লাব্ধাষ্মৈর**? °**এধরাদেশাদ আস্মা:** সংশোধন করা উচিত °**এতদাদেশাদ আস্মকাল**, ১৬ নম্বর লাইনের পরে।

২০. **-মালিকায়:** সংশোধন করা উচিত **-মালিকায়াল**। **দত্তহা:** সংশোধন করা উচিত **দত্তাল** অথবা **দত্তম** (হ এবং ম মধ্যে মিশ্রণ রয়েছে)। **এভোপালভ্যোতেন:** সংশোধন করা উচিত **এভোপালভৈ্যতেন**।

২১. **স্ববিশ্বাসেনাধিকেনা:** সংশোধন করা উচিত **স্ববিশ্বাসেনাধিকারেনা** (ন এর পরিবর্তে প, যেমন ১৩ নম্বরে পাওয়া যায়)। **-কুটুম্বিভিঃ সহ:** সংশোধন করা উচিত **-কুটুম্বিভিঃ সহ**। **নৈতিকা-:** এটি **নিতিকা-** হিসেবেও পড়া যেতে পারে। **-খাটিকারতন্যক্তকানভাকা-:** সংশোধন করা উচিত **-খাটিকারতন্যক্তকানভাকা-**। **(পা)রিনিয়াম্য:** দামোদরপুর শিলালেখের ১৮–১৯ নম্বর লাইনে এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে (সংশোধিত): **দার্ভিক্লর্ম্মহস্তেন অক্তানবাকানলভ্যাম আপবিধ্য চিরকালস্থায়ী-তুষো-অগরদিনাল চিহ্নাইস চতুর্দিশো নিয়ম্য দস্যাথা**। এখানে এমন কোনো উদাহরণ জানা যায় না যেখানে "পারিনিয়াম" শব্দটি তুলনীয় প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

২২. **অক্ষনিবিধর্ম্মেপানু-:** সংশোধন করা উচিত **অক্ষয়ানিবিধর্ম্মেপানু-**।

২২–২৫. এখানে সংশোধিত চারটি উপদেশমূলক স্তবক হিসেবে আর্লা গ্রিফিথ উল্লেখ করেছেন-

ক. শক্তি বর্ষ হাজারো সহস্র স্বর্গে বাসতি ভূমিদাম
অক্ষেপ্টা চনুমন্ত চ তন্য এভ নারকে বাসেত

খ. স্বদত্তম পরদত্তম বা যো হরেতা বাসুন্ধারাম
সে বিশ্বথয়াল ক্রিমির ভূত্বা পিতৃভিসহ পাচ্যতে

গ. পূর্ব্বদত্ত দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ রক্ষ্য যুধিষ্ঠিরা
মহিল মহিমতাল শ্রেষ্ঠ দান চ্রেয়ো 'নুপালনম

গ. যমো 'থা বরূপা বায়ুহ সাক্রাহ শুক্র ব্রহ্মস্পতি
চন্দ্রাদিত্যগ্রহাস সর্বে আভিনন্দন্তি ভূমিদাম

সরল বঙ্গানুবাদ

ওঁম স্বস্তি! মহতি-রক্তমালা ('বড় লাল মালা') অগ্রহারা থেকে, রাজপরিবারের পরামর্শদাতা (কুমারামাত্য) যুথপতি, পরম ভট্টারক (অর্থাৎ রাজা বুদ্ধগুপ্ত) এর পায়ের ধুলোয় আশীর্বাদিত, এবং পরামর্শদাতা কাউন্সিল, বাড়ির মালিকদের, সবার আগে ব্রাহ্মণদের, জানাচ্ছে যে, "নন্দভূতি, যিনি ব্রাহ্মণ এবং যাজুস বিদ্যালয়ের (যাজুর্বেদ) অনুসারী, কৌশথ গোত্রের একজন সদস্য, এবং মহতি-রক্তমালা অগ্রহার থেকে পড়াশোনা করা ব্রাহ্মণদের সম্মিলিত সম্প্রদায়ের একজন, কুড্ডালখাটা (মাটি খোঁড়া) নামে পরিচিত বসতিতে বসবাসকারী।

সে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত বার্তা পাঠাচ্ছে "গুপ্ত যুগের একশো পঁচাত্তরতম বছরে, মহামাত্রা সুবার্চসদত্ত, পুপ্রদ্রাবর্ধন থেকে, আপনাদের সম্মতি নিয়ে, নিয়ম অনুযায়ী বিক্রি করার মাধ্যমে, আমাকে দুই কুল্যবাপ অনাবাদি জমি দিয়েছেন। এই জমি করমুক্ত। পাশাপাশি কোনো কর নেই গোবর্ধনাকা গ্রামে। তিনি আমাকে তা একটি স্থায়ী দানে দিয়েছেন। তিনি এই জমি এমনভাবে দিয়েছেন যাতে আমি সেটি চিরকালীনভাবে ভোগ করতে পারি। পরমেশ্বর তথা রাজা একশো ঊনষট্টি সংখ্যায়, নিজের পুণ্যের জন্য, ওই গোবর্ধনাকা গ্রামটি ব্রাহ্মণদের জন্য দুগ্ধটিক এলাকায় গরুত্তপা শর্তে দান করেছেন।

আমি সম্মানিত গভর্নর ব্রহ্মদত্তকে এই বিষয়ে জানাতে চাই যে, "মহামাত্র সুবার্চসদত্ত আমাকে গোবর্ধনাকা গ্রামে দুই কুল্যবাপ জমি দিয়েছেন। এই জমিও করমুক্ত। এখানে কোনো কর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার এই জমি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পাঁচটি মহা যজ্ঞের নিয়মিত আয়োজন করার জন্য। বিশেষত মা-বাবার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে দান দেওয়া। পরম ঈশ্বর (রাজা) নিজের পুণ্য বৃদ্ধির জন্য গোবর্ধনাকা গ্রামটি ব্রাহ্মণদের জন্য চিরকালীন দান হিসেবে দিয়েছেন। যাতে আমার দেওয়া তাম্রপত্রের জমি হারিয়ে না যায় বা নষ্ট না হয়, আমি অনুরোধ করছি যে, এক নতুন দান আমার নামে প্রতিষ্ঠিত হোক। যাতে, এই জমি এবং দানের সুরক্ষা নিশ্চিত হয় এবং ভবিষ্যতে তা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।"

এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে... একটি নির্দেশনা (আদেশ) দেওয়া হয়েছিল [ব্রাহ্মাদত্তের দ্বারা যাতে নির্ধারণ করা হয়] 'এই ক্ষেত্রে কী উপযুক্ত?' তার পরামর্শদাতা পরিষদ জানায়: 'এই জমির বিনিময়ে অন্য কোনো গ্রাম দান করা যাবে না।' এরপর... ব্রহ্মদত্ত দেশের গভর্নর স্বামীচন্দ্রকে নির্দেশ দেন: 'মধ্যমাক্ষপদিকার (অর্থাৎ, অঞ্চলের) অধিবাসীদের সম্পদের সুরক্ষা, তাদের আশ্রয়, তাদের কর ... বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ... এই তাম্রপত্র জমির বিনিময়ে, আপনাদের জেলা পরিষদের পক্ষ

থেকে অন্য একটি গ্রামে একটি জমি নন্দভূতিকে দেওয়া হবে, যিনি যজুস বিদ্যালয়ের (যজুর্বেদ) ব্রাহ্মণ এবং কৌশথ গোত্রের মানুষ।

এই নির্দেশনার অধীনে, সম্মানিত স্বামীচন্দ্র আমাদের একটি নির্দেশনা দিয়েছেন: 'মহারাজের (ব্রহ্মদত্ত) আদেশ এসেছে (সম্রাট বুধগুপ্তের) পক্ষ থেকে, যিনি পরমেশ্বরের (পরমদেবতা) ভক্ত। নন্দভূতি, যিনি যজুস বিদ্যালয়ের (যজুর্বেদ) ব্রাহ্মণ এবং কৌশথ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি। মহতি-রক্তমালা অগ্রহার থেকে জানাচ্ছেন: 'গোবর্ধনাকা গ্রামে যে অনাবাদি জমি, যা করমুক্ত এবং কোনো কর নেই, যা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে কিনে আমাকে দেওয়া হয়েছিল, সেটি এখন পরমেশ্বরের (রাজার) নির্দেশে আমাকে দেওয়া হয়েছে। গ্রামটির নাম গোবর্ধনাকা। আমি দুগ্ধটিকা এলাকার ব্রাহ্মণদের হাতে মুক্ত করে দিয়েছি। তাই, অনুগ্রহ করে অন্য কোথাও একটি জমি তাম্রশাসন অনুযায়ী দেওয়া হোক। সেই জমি দেওয়া হবে এই জমির বিনিময়ে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, আপনাদের অধীনস্থরা অন্য কোনো গ্রামে একটি তাম্রশাসন জারি করে জমি প্রদান করবেন।"

এই নির্দেশনার ভিত্তিতে, গোবর্ধনাকা গ্রামটির স্থায়ী দানের বিনিময়ে, আমরা খুড়ি-রক্তমালা এলাকায় দুই কুল্যবাপ অনাবাদি জমি প্রদান করেছি, যা করমুক্ত। এই জমির উপর আদতে কোনো কর নেই। দুই কুল্যবাপ। এটি বোঝার পর, এই কারণে, আমাদের বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা এবং এলাকার ভালো পরিবারের বাড়ির মালিকদের সঙ্গে আপনি সেখানে গিয়ে, এই জমিগুলি আট বাই ন' নালা কুড্ডালখাটা অঞ্চলের সরকারি (বা নৈতিক) কিউবিট অনুযায়ী ভাগ করে এবং সীমানা নির্ধারণ করে দেবেন। জমি দেওয়ার পর, আপনাকে এটি চিরকালীন স্থায়ী দান হিসেবে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।'

এবং ভক্তি পরিপূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞব্যাস বলেছেন:

ক. যে ব্যক্তি জমি দান করে, সে ষাট হাজার বছর স্বর্গে বাস করবে; যে ব্যক্তি দানকে চ্যালেঞ্জ করবে বা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে, সে সমান সংখ্যক বছর নরকে বাস করবে।

খ. যে ব্যক্তি নিজের বা অন্যের দেওয়া জমি চুরি করবে, সে মল-মূত্রে পোকা হয়ে, তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সেদ্ধ হবে।

গ. আপনি, যুধিষ্ঠির, মহারাজ, ব্রাহ্মণদের দেওয়া জমি কঠোরভাবে সুরক্ষা করবেন। সুরক্ষা দেওয়া দান দেওয়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

ঘ. যম, বরূপ, বায়ু, ইন্দ্র, শুক্র, ব্রহ্মস্বতী, চন্দ্র, আদিত্য এবং গ্রহসমূহ: তারা সবাই জমি দানকারীকে আনন্দিত করে!

উপরের তাম্রশাসনের লেখাটি সর্দার আর্যদাস লিখেছেন। এখানে নথিরক্ষক হিসেবে ছিলেন মনোরথদাস। আর তখনকার সময় বছর ১৫৯, জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ তারিখ।

সময়কাল যাচাই :

মহাতি-রক্তমালা তাম্রলিপিটি গুপ্ত যুগের ১৫৯ তম বছর, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ তারিখে রচিত হয়েছিল, তবে সঠিক সপ্তাহের দিন উল্লেখ করা হয়নি। এর তারিখ নির্ধারণের জন্য আমরা ইরান স্তম্ভের তাম্রলিপির তথ্য ব্যবহার করতে পারি, যা গুপ্ত যুগের ১৬৫ তম বছরে রয়েছে এবং সেখানে

সপ্তাহের দিনও উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই তাম্রলিপির তথ্য অনুযায়ী, বছর ১৬৫ ছিল আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষ ১২, এবং সপ্তাহের দিন ছিল বৃহস্পতিবার। এই তারিখের গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে রূপান্তর করলে তা ৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, ২১ জুন বৃহস্পতিবার হবে।

এই তারিখটি ৪০৭ সাকায় বর্তমান এবং ৪০৬ সাকা অতীত হিসেবে গণ্য। এটি আমাদের তাম্রলিপির তারিখের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা ৬ বছর আগে ছিল। ফলে, বছর ১৫৯ গুপ্ত যুগের তারিখটি ৪০১ সাকা বর্তমান বা ৪০০ সাকা অতীত হয়ে দাঁড়ায়, যা খ্রিষ্টাব্দের ৪৭৮/৯ সালের সমান। তবে, এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা রয়েছে, যেমন পক্ষ তথা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা এবং মাসের নামকরণের পদ্ধতি ছিল পূর্ণিমান্তা তথা পুর্নিমার আগের দিন হিসেবে। কিংবা অমান্তা তথা অমাবস্যার পরের দিন। তবে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার নয়।

অন্যদিকে, দিন গণনার পদ্ধতি হিসেবেও এগুলো স্পষ্ট নয়। দিনগুলো ধারাবাহিকভাবে ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত ছিল কি না, বা দ্বিতীয় পাক্ষায় আবার ১ থেকে শুরু হত কি না, তা আমাদের কাছে অজানা। আমাদের কাছে একটি কারণ আছে যে, দিন গণনার পদ্ধতি সম্ভবত ধারাবাহিক ছিল (১ থেকে ৩০), কারণ বৈগ্রাম তাম্রলিপিতে (লাইন ২৫) এবং কুমারগুপ্ত-১ -এর তাম্রলিপিতে ২য় এবং ২৫ তম লাইন যথাক্রমে ১২৮ এবং ১২৯ গুপ্ত বছরের কথা বলছে। উল্লিখিত তারিখগুলিতে ১৫ এর বেশি দিনের সংখ্যা পাওয়া গেছে। অতএব, তৃতীয় বিকল্পটি বাতিল করা যেতে পারে। কারণ, অমান্তা পদ্ধতিতে একটি মাসের ৮ তারিখ শুক্লপক্ষে পড়বে।

ফ্লিটের গবেষণার একটি প্রধান ফলাফল যদি আমরা মেনে নিই সেখানে তারিখ নিয়ে জটিলতা কিছুটা কমবে। গুপ্ত যুগে যখন এই তাম্রলিপিগুলি লেখা হয়েছিল, তখন পূর্ণিমান্তা পদ্ধতিই মূলত ব্যবহৃত হত। আর যদি তাই হয় আমরা আমাদের তারিখ রূপান্তরটি আরও সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারি। এর ফলে, আমাদের রূপান্তর হবে ৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, ১১ মে, বৃহস্পতিবার এই মহাতি-রক্তমালা তাম্রশাসন জারি করা হয়েছিল।

বর্ণনাক্রম ও গাঠনিক কাঠামো

এই তাম্রলিপিটিতে অনেক স্তরের প্রতিবেদনমূলক বক্তব্য রয়েছে। গাঠনিক দিক পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমে তা মোটেও পরিষ্কার নয়। অন্যদিকে অক্ষরের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিছু কিছু বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে গল্পের কাঠামো অনুয়ায়ী একে কয়েকটি ধাপে বিন্যস্ত করাই যায়-

১. প্রারম্ভিকা: যেখানে তাম্রলিপিটি জারি করা হয়েছে, বক্তা এবং প্রাপকদের পরিচয় (লাইন ২ "বোধযন্তি" পর্যন্ত)। এখানে তাম্রলিপিটি কোথায় এবং কে-কে এর মধ্যে কথা বলছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল থেকে প্রাপকদের উদ্দেশ্যে (লাইন ২-৩ "কুড্ডালা-" থেকে "বিজ্ঞপ্তি") মূলত যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল প্রাপকদের উদ্দেশ্যে তাদের বার্তা বা নির্দেশনা দিচ্ছে।

৩. নন্দভূতি থেকে যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে (লাইন ৩-৪ "যত" থেকে "বিজ্ঞপ্তি") হিসেবে নন্দভূতি যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে তার বক্তব্য বা অনুরোধ জানাচ্ছে।

৪. নন্দভূতি থেকে ব্রাহ্মদত্ত এবং তার কাউন্সিলকে (লাইন ৮-১২ "মামা" থেকে "কৃততাম্") নন্দভূতি ব্রহ্মদত্ত এবং তার কাউন্সিলকে কিছু জানাচ্ছে, সম্ভবত একটি অনুরোধ বা নির্দেশনা।

৫. নন্দভূতি থেকে যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে (লাইন ১২-১৩ "যতঃ" থেকে "জ্ঞাপিত") নন্দভূতি আবার যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে কিছু তথ্য বা বার্তা জানাচ্ছে।

৬. ব্রহ্মদত্তের কাউন্সিল (লাইন ১৩ "এটটক্ষেত্র-" থেকে "দিয়াতাম্") ব্রাহ্মদত্তের কাউন্সিল একটি সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা প্রদান করছে।

৭. নন্দভূতি থেকে যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে (লাইন ১৩-১৪ "যত:" থেকে "দত্তাহ") নন্দভূতি আবার যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে তার সিদ্ধান্ত বা বার্তা জানাচ্ছে।

৮. ব্রহ্মদত্ত থেকে স্বামীচন্দ্রকে (লাইন ১৪-১৫ "তব" থেকে "দাপায়ক্ষ্য[সিতি]") ব্রহ্মদত্ত স্বামীচন্দ্রকে নির্দেশ দিচ্ছে।

৯. যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল থেকে প্রাপকদের (লাইন ১৬ "এটাদাদেসাদ" থেকে "দত্তাহ") যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল প্রাপকদের উদ্দেশ্যে তাদের বার্তা পুনরায় পাঠাচ্ছে।

১০. স্বামীচন্দ্র থেকে যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিলকে (লাইন ১৬ "মামা" থেকে "দত্তা") স্বামীচন্দ্র তার কাজ বা নির্দেশনা জানাচ্ছে।

১১. ব্রাহ্মদত্ত থেকে স্বামীচন্দ্রকে (লাইন ১৬-১৭ "মহতি" থেকে "বিজ্ঞপ্তি") ব্রাহ্মদত্ত স্বামীচন্দ্রকে আরও কিছু নির্দেশনা দিচ্ছে।

১২. নন্দভূতি থেকে ব্রাহ্মদত্তকে (লাইন ১৭-১৮ "সাধুনা" থেকে "কৃততাম্") নন্দভূতি ব্রাহ্মদত্তকে কিছু অনুরোধ করছে।

১৩. ব্রাহ্মদত্ত থেকে স্বামীচন্দ্রকে (লাইন ১৯ "যত:" থেকে "দাপায়ক্ষ্যসিতি") ব্রাহ্মদত্ত স্বামীচন্দ্রকে তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

১৪. যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল থেকে প্রাপকদের (লাইন ১৯-২২ "যতঃ এধারসাদ" থেকে "-লয়ক্ষ্যসিতি")যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল প্রাপকদের পুনরায় নির্দেশনা দিচ্ছে।

১৫. নিষেধাজ্ঞামূলক সূত্র (লাইন ২২ "উক্তং" থেকে ২৫ "ভূমিদাম") এখানে কিছু সতর্কতা বা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে জমি দান বা অন্য কোনও বিষয়ে সঠিকভাবে আচরণ করা হয়।

১৬. শেষাংশ (লাইন ২৫-২৬ "লিখিতল" থেকে "দি ৮") তাম্রলিপির শেষ অংশ, যেখানে লেখকের নাম এবং তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ণনার ক্রম ও ধারা থেকে বোঝা যায়, এটি একটি অত্যন্ত জটিল তাম্রলিপি, যেখানে একাধিক স্তরে প্রতিবেদনমূলক তথ্য যুক্ত ও ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন বক্তা এবং প্রাপকের মধ্যে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের মাধ্যমে একটি জটিল আইনগত প্রক্রিয়া বা জমি দানের চুক্তি গঠিত হচ্ছে। লিপির প্রথম অংশে একটি প্রারম্ভিকা রয়েছে, যেখানে এই তাম্রলিপির স্থান, বক্তা এবং প্রাপকরা চিহ্নিত করা

হয়েছে। এরপর যুথপতি এবং বিক্ষায় কাউন্সিল প্রাপকদের উদ্দেশ্যে তাদের বার্তা বা নির্দেশনা দেয়। এরপর নন্দভূতি বিভিন্ন বক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এবং তার বক্তব্য বা অনুরোধগুলি প্রদান করে।

ব্রহ্মদত্ত এবং তার কাউন্সিল পরবর্তীতে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন এবং জমির দান সংক্রান্ত বিষয়ে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাম্রলিপির শেষাংশে একটি নিষেধাজ্ঞামূলক সূত্র এবং কলফন দেওয়া হয়েছে, যেখানে লেখকের নাম এবং লিপির তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রলিপিটি একটি জটিল আইনি প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়, যেখানে একাধিক পক্ষের মধ্যে চুক্তি, জমি দান এবং সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর কাঠামো পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, এটি একটি আনুষ্ঠানিক এবং আইনি দলিল, যা জমি দানের শর্তাবলী এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

মহাতি-রক্তমালা লিপির প্রধান চরিত্র ও ব্যক্তি :

এই তাম্রলিপিটি গুপ্তযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা ১৫৯ নম্বর সালে তারিখিত, এবং এখানে প্রথমবারের মতো একটি ভূমি দানের রাজকীয় প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্কের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এই তারিখটি বুদ্ধগুপ্তের শাসনকালকে নির্দেশ করে, যিনি এখানে **পরমভট্টারক** এবং **পরমদেব** উপাধি দিয়ে উল্লেখিত হয়েছেন। যাই হোক, এই তাম্রলিপিতে **পরমদৈবত** উপাধিও ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপাধি আরও অনেক রাজার ক্ষেত্রে অন্যত্রও দেখা যায়। বিশেষ পুণ্ড্রাবর্ধন অঞ্চলের উদাহরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, "পরমদৈবত" একটি সাধারণ উপাধি হতে পারে যা শুধুমাত্র ভগবান বিষ্ণুর প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত নয়, বরং এটি দেবতাদের প্রতি এক মহান শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রকাশের জন্যও ব্যবহার হতে পারে।

মহাতি-রক্তমালা তাম্রলিপিতে বুদ্ধগুপ্তের নাম সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও, তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পূর্ববর্তী তাম্রলিপিগুলির তুলনায় অনেক বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্বে পুণ্ড্রাবর্ধনা অঞ্চলে রাজাদের কোনো সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে, এই তাম্রলিপিটি প্রথমবারের মতো সেখানে একটি রাজকীয় জমিদান প্রদানের প্রমাণ সরবরাহ করে, যা দেখায় যে কিভাবে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতির মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই দলিলটি প্রথমবারের মতো নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর রাজকীয় নীতি কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা তুলে ধরে। যেখানে স্থানীয় স্তরের প্রশাসনিক ও রাজকীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে সংযোগ দেখা যায়, এবং রাজা বুদ্ধগুপ্ত এখানে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত জমির অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন। এটি প্রমাণ করে যে গুপ্তযুগের সময়কালেও, কেন্দ্রীয় শাসকের সিদ্ধান্তগুলি স্থানীয় সমাজ ও নাগরিকদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলত। এটি আমাদেরকে গুপ্তযুগের প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজকীয় ক্ষমতার বিস্তার সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে, যেখানে রাজা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নয়, বরং তার শাসনাধীন এলাকাগুলিতেও প্রভাব বিস্তার করতেন।

বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে **কুমারামাত্য যুথপতি** উল্লেখযোগ্য। যদিও কিছু স্থানে **যুথপা** একটি পদ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, এখানে এটি বিশেষ একটি নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যুথপতির পদটি গুপ্তযুগের অন্যান্য তাম্রলিপিতেও দেখা যায়, এবং তার কাজের গুরুত্ব ও প্রভাব পরিষ্কারভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

এই তাম্রলিপির সময়কার প্রধান প্রাদেশিক প্রশাসক ছিলেন **ব্রাহ্মদত্ত**, যিনি সম্ভবত দামোদরপুর তাম্রলিপির সময়েও দায়িত্বে ছিলেন। এই তথ্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে প্রশাসনিক কাঠামোটি বেশ জটিল ছিল, এবং দুটি স্তরের **পরিষদ** ছিল, একটিতে যুথপতি নেতৃত্ব দেন এবং অন্যটি উচ্চতর স্তরের ছিল। এই উচ্চতর স্তরের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে তা সম্ভবত **ভুক্তি** হতে পারে, যেহেতু ব্রাহ্মদত্ত এই স্তরের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাম্রলিপির মধ্যে একটি স্থান গ্যাপ রয়েছে, যেখানে এই বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

একজন কর্মকর্তা, **স্বামীচন্দ্র**, যিনি **দশ উপরিক** নামে পরিচিত, তিনি **ব্রহ্মদত্ত** এবং **যুথপতি** এর মধ্যে মধ্যস্থতা করেছেন। তার নাম কুলকুরি-সুলতানপুর তাম্রলিপিতেও দেখা গিয়েছে, যা ৩৯ বছরের ব্যবধানের মধ্যে প্রকাশিত। এর মানে, হয়তো এটি এক ব্যক্তির জীবনের দুটি আলাদা সময়ের ঘটনা, যদিও এটি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। এছাড়া, **নন্দভূতি** এবং মূল দাতা **সুবার্চসদত্ত** প্রমুখের নাম আমাদের কাছে আজও অজানা। কারণ এই নামগুলো অন্য কোনো তাম্রলিপিতে বা এই ধরণের প্রামাণিক উৎসে পাওয়া যায়নি। সে হিসেবে মহাতি-রক্তমালা তাম্রলিপির তথ্যসূত্র ও বিবরণ আরও আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই তথ্য থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করতে পারি, তা হলো, গুপ্তযুগের প্রশাসনিক কাঠামো ও ভূমি দানের প্রক্রিয়া কিভাবে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হত।

মহাতি-রক্তমালা তাম্রলিপির সবচেয়ে আকর্ষণীয় নতুনত্বগুলির মধ্যে একটি হল **গরুত্তপ** শব্দটি, যা ৭ এবং **১১** নম্বর লাইনে দেখা গেছে। এই শব্দটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। তবে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে এটি ভুলভাবে পড়া হতে পারে। অনেকেই এই অংশটিকে **গুপ্ত** পড়েছিলেন। তবে যতো অস্পষ্টই হোক সেখান থেকে যা পড়া যায় প্রথম অক্ষরটি **গু** হতে পারে না। কারণ যখন গ-এর সঙ্গে মধ্যবর্তী **উ** যোগ করা হয়, তখন এটি সাধারণত ডানদিকে বাঁক নেমে উপরের দিকে চলে যায় (যেমন **তু** এবং **ভু** এর ক্ষেত্রে)। এখানে অক্ষরটি **গ** হবে, যা **ভগবত** শব্দের গ-র সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত করা যায়। তবে গ-এর আকার একদম একই। **রু** এবং **উ** অক্ষরের মধ্যে আকারের অনেক মিল রয়েছে এই লিপিতে—যেমন **উক্তং** (লাইন ২২) এবং **বরূপ** (লাইন ২৪) এর অক্ষরের আকার দেখে এমনটা মনে করাই শ্রেয়।

লিপির ৭ নম্বর লাইনে তৃতীয় অক্ষরটি কিছুটা কঠিন হলেও, **১১** নম্বর লাইনে এটি **ত্ত** স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; একটি সম্ভাব্য **গঅত্ত** পড়া বোঝার অযোগ্য হবে। আর্লো গ্রিফিথ তার পড়া **গরুত্তপ** শব্দের উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রস্তাব করে গিয়েছেন। তাঁর মতে এই **গরুত্তপ-শাসন** এর মানে হতে পারে 'একটি রাজকীয় গরুড় সীল সহ'। তবে মহাতি-রক্তমালা তাম্রলিপিটি শুধুই একটা রাজকীয় আদেশের কথা বলেছে। তবে কোনো রাজকীয় চার্টার উপস্থাপন করে নাই। পাশাপাশি তার সীলের ওপর কোনো গরুড় প্রতীক নেই।

মহাতি-রক্তমালা লিপিতে বর্ণিত স্থান :

প্রাচীন এবং আধুনিক বাংলার মধ্যে কিছু স্থাননামিক ধারাবাহিকতার উদাহরণ জানা যায় মহাতি-রক্তমালা লিপিতে। এখানে **বৈগ্রাম** নামটি, যা সম্ভবত **বৈগ্রাম** নামে পরিচিত আধুনিক স্থানের সাথে সম্পর্কিত। এখানে উল্লেখিত স্থান নামগুলোর মধ্যে রয়েছে—**মহতি-রক্তমালা**, **খুড়ি-রক্তমালিকা**, **কুড্ডালখাটা**, **গোবর্ধনাকা**, **দুগ্ধটিকা** এবং **মধ্যমাক্ষপদিকা**। বিভিন্ন গবেষক অন্য গুপ্ত যুগের লিপিতেও

এই নামগুলো পেয়েছেন **তবে** আধুনিক বাংলাদেশ বা পশ্চিম বাংলার স্থাননামের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়নি।

বগুড়ার কাছাকাছি এবং আশেপাশের জেলায় দীর্ঘদিন মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা এবং সরেজমিনে ভ্রমণ থেকে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক উল্লিখিত এই অঞ্চলগুলোকে নিজের মতো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। আমার মতে বগুড়ার সদর উপজেলার শেখেরকোলা ইউনিয়নের কোথাও এই মহতি-রক্তমালা অঞ্চল অবস্থিত হতে পারে। ওদিকে কাহালুর কালাই হতে পারে **খুড়ি-রক্তমালিকা** এবং শাহজাহানপুরের খোট্টাপাড়ার **কুড্ডালখাটা** হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। **গোবর্ধনাকা** হিসেবে সহজেই গাবতলীকে চিহ্নিত করা যায়। পাশাপাশি **দুগ্ধটিকা** বলতে নন্দীগ্রামের থালতা মাঝগ্রামকে নির্দেশ করা যেতে পারে। অন্যদিকে সোনাতলার দিগদাইড় এলাকা **মধ্যমাক্ষপদিকা** হওয়ার সম্ভাবনা অনেক। তবে এইগুলো নিছক অনুমান। এই বিষয়টি নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

উপসংহার :

উপর্যুক্ত মহাতি-রক্তমালা তাম্রলিপিটি গুপ্তযুগের প্রশাসনিক কাঠামো, ভূমি দানের প্রক্রিয়া এবং রাজকীয় আদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। এই তাম্রলিপির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই কিভাবে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে জমি দান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল এবং এটি একাধিক স্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। বিশেষ করে, এই দলিলটি স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে রাজকীয় ক্ষমতার সমন্বয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ। এই মাধ্যমে আমরা তৎকালীন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোতে ক্ষমতা বিন্যাসের সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছি।

তাম্রলিপিটি গুপ্তযুগের সমাজ, ধর্ম, ও প্রশাসন সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করে, যা আমাদেরকে ওই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বুঝতে সাহায্য করে। প্রথাগত দানের পদ্ধতি, জমির করমুক্ত হওয়া, রাজকীয় দানের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য নৈতিক বিষয়গুলো এ প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে বিবৃত হয়েছে। তাম্রলিপিটি প্রমাণ করে যে, গুপ্তযুগের শাসকরা শুধুমাত্র রাজ্য শাসনই করেননি, বরং তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের কল্যাণে মনোযোগী ছিলেন। রাজকীয় জমি দান প্রথা ছিল এক ধরনের ধর্মীয় কর্তব্য, যেখানে রাজা তার পুণ্য অর্জনের জন্য ভূমি দান করতেন। এই জমি দানের মাধ্যমে রাজা শুধু সমাজে তার পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করতেন না, বরং স্থানীয় ব্রাহ্মণদের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেন।

রাজকীয় দানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নীতি অনুসরণ করা ছিল না, বরং এটি ছিল শাসক ক্ষমতার প্রসারণ এবং রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জমির করমুক্ত হওয়ার প্রথা, বিশেষ করে গোবর্ধনাকা গ্রামের জমির করমুক্তির বিষয়টি, একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা যায়, যা শাসক কর্তৃক স্থানীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ। এছাড়া, এ ধরনের জমি দানগুলো সামগ্রিকভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সমতা এবং শান্তির প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল।

এই দানের প্রথাগুলি মদত দিতো সমাজের ধর্মীয় উন্নয়নকে, বিশেষ করে যাজুস বিদ্যালয়ের (যাজুর্বেদ) অনুসারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যারা তখনকার সমাজের শিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে ধরে রাখার দায়িত্বে ছিলেন। তাম্রলিপিতে উল্লিখিত বিভিন্ন জমি দান ও করমুক্ত জমির মাধ্যমে গুপ্ত

শাসকেরা তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা, সামাজিক দায়িত্ব এবং ধর্মীয় কর্তব্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠা প্রতিফলিত করেছেন।

অন্যদিকে, এই তাম্রলিপিতে যুথপতি, ব্রাহ্মদত্ত এবং স্বামীচন্দ্রের মত কর্মকর্তাদের ভূমিকা আমাদের সমাজে প্রশাসনিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয়। রাজকীয় আদেশ ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার সময় প্রশাসন ছিল একেবারেই সমন্বিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা স্থানীয় স্তরে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কাজ করতেন।

এভাবে, গুপ্তযুগের এই তাম্রলিপি শুধু জমি দানের একটি আইনগত দলিল হিসেবে নয়, বরং এটি সেই সময়কার সমাজ, ধর্ম এবং প্রশাসনের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য সম্পর্কের প্রতিফলন। এটি আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে গুপ্তযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ প্রদান করে, যেখানে রাজা, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সমাজের শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

এই তাম্রলিপির মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন গুপ্তযুগের প্রশাসনিক কার্যক্রমের জটিলতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানতে পারি, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানের নাম, স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক এবং রাজকীয় দানের বিভিন্ন শর্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।

এছাড়া, এই তাম্রলিপির মধ্য দিয়ে স্থাননামিক ধারাবাহিকতার উদাহরণ ও তাদের আধুনিক বাংলা জায়গার সঙ্গে সম্পর্কের ধারণা পাওয়া যায়, যা আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ বহন করে। গুপ্তযুগের প্রশাসনিক কাঠামো এবং ভূমি দানের প্রক্রিয়া একটি জটিল এবং সাংগঠনিক উপাদান ছিল, যা এই তাম্রলিপি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে এবং আমাদের প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র

Bakker, H. T., Bisschop, P. C., Yokochi, Y., Mirnig, N., & Törzsök, J. (2014). The Skandapurāṇa Volume IIb: Adhyāyas 31-52. The Vāhana and Naraka Cycles (p. 384). Brill.

Basak, R. (1919–20a). The five Damodarpur copper-plate inscriptions of the Gupta period. *Epigraphia Indica, 15*, 113–145.

Basak, R. (1919–20b). Tipperah copper-plate grant of Lokanatha: The 44th year. *Epigraphia Indica, 15*, 301–315.

Basak, R. (1923–4). Dhanaidaha copper-plate inscription of the time of Kumaragupta I: The year 113. *Epigraphia Indica, 17*, 345–348.

Basak, R. (1931–2). Baigram copper-plate inscription of the [Gupta]-year 128. *Epigraphia Indica, 21*, 78–83.

Bhandarkar, D. R. (1981). *Inscriptions of the early Gupta kings*. In B. C. Chhabra & G. S. Gai (Eds.), *Corpus Inscriptionum Indicarum* (3rd ed., Vol. 3). Delhi: Archaeological Survey of India.

Bhattacharya, S. C. (2005). The Jagajjibanpur plate of Mahendrapala: Comprehensively re-edited. *Journal of Ancient Indian History, 23*, 61–125.

Bhattasali, N. K. (1925–6). The Ghugrahati copper-plate inscription of Samachara-Deva. *Epigraphia Indica, 18*, 74–86.

Bhattasali, N. K. (1935). The new Saktipur grant of Lakxmapa Sena Deva and geographical divisions of ancient Bengal. *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 73–113.

Chattopadhyaya, B. D. (1977). Currency in early Bengal. *Journal of Indian History, 55*(5), 41–60.

Dani, A. H. (1986). *Indian palaeography* (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.

Dikshit, K. N. (1923–4). A note on the dates of the Gupta copper plates from Damodarpur. *Epigraphia Indica, 17*, 193.

Dikshit, K. N. (1929–30). Paharpur copper-plate grant of the [Gupta] year 159. *Epigraphia Indica, 20*, 59–64.

Dubey, D. P., & Acharya, S. K. (2014). Raktamala copper-plate grant of the [Gupta] era 180. *Journal of History and Social Sciences, 5*. http://jhss.org/articleview.php?artid=232

Fleet, J. F. (1891). The Gupta-Valabhi era. *Indian Antiquary, 20*, 376–389.

Furui, R. (2011a). Indian Museum copper plate inscription of Dharmapala, year 26: Tentative reading and study. *South Asian Studies, 27*(2), 145–156.

Furui, R. (2011b). Panchrol (Egra) copperplate inscription of the time of Sasaoka: A re-edition. *Pratna Samiksha, New Series 2*, 119–130.

Furui, R. (2013). The Kotalipada copperplate inscription of the time of Dvadasaditya, year 14. *Pratna Samiksha, New Series 4*, 89–98.

Furui, R. (forthcoming). Ajivikas, Mapibhadra and early history of eastern Bengal: A new copper plate inscription of Vainyagupta and its implications.

Griffiths, A. (2018). Four more Gupta-period copperplate grants from Bengal. Pratna Samiksha: a Journal of Archaeology, (9), 15-57.

Griffiths, A., & Southworth, W. A. (2007). La stèle d’installation de Sri Satyadevesvara: Une nouvelle inscription du Campa trouvée à Phước Thiện. *Journal Asiatique, 295*(2), 349–381.

Griffiths, A., & Southworth, W. A. (2011). Études du Corpus des inscriptions du Campa II. La stèle d’installation de Sri A didevesvara: Une nouvelle inscription de Satyavarman trouvée dans le temple de Hoà Lai et son importance pour l’histoire du Papduraoga. *Journal Asiatique, 299*(1), 271–317.

Gupta, C. (1996). Land-measurement and land-revenue system in Bengal under the Senas. In D. Mitra (Ed.), *Explorations in art and archaeology of South Asia: Essays dedicated to N. G. Majumdar* (pp. 573–593). Calcutta: Directorate of Archaeology and Museums, Government of West Bengal.

Gupta, K. (1967). *Copper-plates of Sylhet, Volume I (7th–11th century AD) containing copper-plates of Bhaskaravarma, Marundanatha, Srichandra, Govinda-Kesava and Isana*. Rasheedistan: Lipika Enterprises.

Jain, B. (1977). Shankarpur plate of Budhagupta and Harivarman: Gupta year 166. *Journal of the Epigraphical Society of India, 4*, 62–66.

Khan, A. (2007). Bengal copperplates: Provenances and preservation data. *Pratnatattva: Journal of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University, 13*, 5–36.

Khan, A. (2010). Some comments on the seals of Bengal copperplates. *Journal of Bengal Art, 15*, 95–108.

Kielhorn, F. (1896–7). Khalimpur plate of Dharmapaladeva. *Epigraphia Indica, 4*, 243–254.

Maity, S. K. (1970). *Economic life in northern India in the Gupta period (cir. A.D. 300–550)* (Revised 2nd ed.). Delhi: Motilal Banarsidass.

Majumdar, N. G. (1935–6a). Nandapur copper-plate of the Gupta year 169. *Epigraphia Indica, 23* (appeared 1940), 52–56.

Majumdar, N. G. (1935–6b). Mallasarul copper-plate of Vijayasena. *Epigraphia Indica, 23* (appeared 1940), 155–161.

Misra, S. P. N., & Majumdar, R. C. (1951). The Jajilpara grant of Gopala II, year 6. *Journal of the Asiatic Society (Letters), 17*(2), 137–144.

Pargiter, F. E. (1910). Three copper-plate grants from East Bengal. *Indian Antiquary, 39*, 193–216.

Raven, E. M. (1994). *Gupta gold coins with a Garuda-banner, Samudragupta-Skandagupta* (2 vols.). Gonda Indological Studies, 1. Groningen: Egbert Forsten.

Sanderson, A. (2009). The Saiva age: The rise and dominance of Saivism during the early medieval period. In S. Einoo (Ed.), *Genesis and development of Tantrism* (pp. 41–349). Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo.

Sanyal, N. (1955–6). Sultanpur copper-plate inscription. *Epigraphia Indica, 31*, 57–66.

Sanyal, R. (2010). Copperplate inscriptions of West Bengal: Finding find-spots and locating localities. *Pratna Samiksha, New Series 1*, 107–134.

Sarkar, H., & Pande, B. M. (1999). *Symbols and graphic representations in Indian inscriptions*. New Delhi: Aryan Books International.

Sircar, D. C. (1943). Kalaikuri copper-plate inscription of the Gupta year 120 (AD 439). *Indian Historical Quarterly, 19*, 12–26.

Sircar, D. C. (1947). The Kailan copper-plate inscription of King Sridharapa Rata of Samatata. *Indian Historical Quarterly, 23*, 221–241.

Sircar, D. C. (1965). *Select inscriptions bearing on Indian history and civilization, Volume I: From the sixth century BC to the sixth century AD* (2nd ed.). Calcutta: University of Calcutta.

Sircar, D. C. (1966). *Indian epigraphical glossary*. Delhi: Motilal Banarsidass.

Sircar, D. C. (1969). Jagadishpur plate of the Gupta year 128. *Epigraphia Indica, 38*, 247–252.

Sircar, D. C. (1973). *Epigraphic discoveries in East Pakistan*. Calcutta: Sanskrit College.

Sircar, D. C. (1983). *Select inscriptions bearing on Indian history and civilization, Volume II: From the sixth to the eighteenth century AD*. Delhi: Motilal Banarsidass.

Willis, M. (2009). *The archaeology of Hindu ritual: Temples and the establishment of the gods*. Cambridge: Cambridge University Press.

Yamazaki, T. (1982). Some aspects of land-sale inscriptions in fifth and sixth century Bengal. *Acta Asiatica: Bulletin of the Institute of Eastern Culture, 43*, 17–36.

[**Abstract :** In the history of pre-Pala Bengal, copperplate inscriptions are extremely rare. In this context, the recently discovered Gupta-era copperplate inscription named Mahati-Raktamala from Pundrabardhan provides a new perspective. This inscription was issued in the reign of Budhagupta in 478 CE and is written in Sanskrit. It is a land-sale document related to the donation of fallow land for religious purposes. The present study involves the partial deciphering, verification of the text, Bengali translation, and analysis of this copperplate, through which the social and religious structure of the pre-Pala period has been reassessed. Specifically, this document presents an important aspect of the land donation system as a religious deed. The inscription provides a clear picture of the purpose of land donation and its relationship with religious activities in society. By conducting a comparative analysis with various previous documents, an unexplored chapter of the history of Pundrabardhan has been uncovered, providing new information about the political, social, and religious structure of the region. The reign of Budhagupta played a significant role in the history of pre-Pala Pundrabardhan, and this document has become an integral part of the lifestyle and culture of that era.]

Keywords : Pundrabardhan, North Bengal, Copperplate, Stone Inscription, Sanskrit, Land Sale, Budhagupta, Garuda Seal, Ghosadwipak.